শারদীয়া সংখ্যা ১৩৮৪
ভাদ্র-আশ্বিন
সন্দেশ
লীলা মজুমদার
নলিনী দাশ
ও সত্যজিৎ রায়
সম্পাদিত

ভাদ্র—আশ্বিন

শারদীয়া সংখ্যা

লীলা মজুমদার - নলিনী দাশ
ও সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত

পৃষ্ঠা

১। যাত্রার আসর—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২। রাজা ও রাজদ্রোহী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৪। মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প—সত্যজিৎ রায়
২৩। তোলাতুলি—অসিতবরণ হাজরা
২৪। কাটুরকুটুর পদ্মমুখী আর কাঠুরে কত্তা—নবনীতা দেবসেন
৩৫। অঙ্ক ও বেলমাথা—আশা দেবী
৩৭। মাঝরাত্তিরে—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৩৮। পুক্কিমিত্তির কাণ্ডকীর্তি—সবিতা ঘোষ
৪০। ছবি—শৈবাল চক্রবর্তী
৪১। জোড়া সাপ—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
৪৩। সেকাল ও একাল—সুব্রত চক্রবর্তী
৪৭। সিদ্ধিলাভ—অমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী
৫১। ছোট্ট ছড়া—অনির্বাণ রায়
৫৩। এমন কথা নাই—রবি ভট্টাচার্য
৫৪। খোকাখুকু—কানাই সামন্ত
৫৬। টাকডুমাডুম—রেবন্ত গোস্বামী
৫৭। বাবা নয়—মহাশ্বেতা দেবী
৫৮। শরতের ছুটি—করুণাময় বসু
৬০। ছড়া—ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়
৬২। রাত বিরেতে—সুবীর রায়
৬৪। স্বপনবুড়োর ছড়া
৬৫। ওরা আর আমরা—আশাপূর্ণা দেবী
৭০। বিস্মৃত বিভীষণ কাহিনী—জয়িতা মিত্র
৭২। আধুনিকতার পালা—অশোক মুখোপাধ্যায়
৭৩। আজব কারিগর—গৌরী ধর্মপাল
৭৮। তরক্ষু শল্লকী সংবাদ—প্রেমেন্দ্র মিত্র
৮০। ফুলের ছড়া—ধূর্জটি প্রসাদ দত্ত
৮১। গল্পসল্প—লীলা মজুমদার
৮৪। দুষ্টু স্বপ্ন—শৈল চক্রবর্তী
৮৯। ভূতোর ডাইরি—লীলা মজুমদার
৯১। শীলবাবুদের বাড়ি—জগদানন্দ গোস্বামী
৯৬। ছড়া—আদিনাথ নাগ

পৃষ্ঠা
৯৭। গণ্ডালু ও রাণী রূপমতীর রহস্য—
নলিনী দাশ
১০৫। একস্‌কার্শন—শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ
১১১। বিকল্পে—প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
১১২। ভাল্লুকের গল্প—জীবনকৃষ্ণ ঘোষ
১২১। কাঞ্জিলালের বন—ভবানীপ্রসাদ দে
১২২। মাছভূত—কিরণ সেন
১২৬। ডবল ডেকার—প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়
১২৭। ভালো কথা—হাসিরাশি দেবী
১২৮। ছায়া ডাকাত—সুলতা সেনগুপ্ত
১২৯। কং—সন্দীপ রায়
১৩৪। সাবধানে মার নেই—
ভবানীপ্রসাদ মজুমদার
১৩৫। হাওয়া মোরগ—প্রণব মুখোপাধ্যায়
১৩৬। এক রাজবাড়ির গল্প—পূর্ণেন্দু পত্রী
১৪০। গণৎকার—রাধারমণ গোস্বামী
১৪১। ভালমানুষ হরবাবু—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
১৪৩। ছড়া—সুভাষপ্রসন্ন ঘোষ
১৪৩। ছড়া—অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৪৫। বিষফুল—সত্যজিৎ রায়
১৫৫। হবে না মধুর বিষ্টি ?—বারীন বসু
১৫৭। সংস্কার—অজয় হোম
১৫৯। আঁকিয়ে—গোবিন্দ প্রসাদ বসু
১৬০। সম্পাদকের চিঠি
১৬১। প্রতিদ্বন্দ্বী—অজেয় রায়
১৬৭। বেচারা—স্বপন কুমার ঘোষ
১৭১। কাগজ ফুলের গাছে—তারাপদ রায়
১৭৭। কালো চিতা—মঞ্জিল সেন
১৮২। সাক্ষাৎকার : সুরজিৎ সেনগুপ্ত
—গৌতম গুপ্ত
১৮৪। ভালো খেলতে হলে—শান্ত মিত্র
১৮৭। পেলের কথা—অজয় হোম

সত্যজিৎ রায়

মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প

মোল্লা নাসীরুদ্দীনের নামে অনেক গল্প প্রায় হাজার বছর ধরে পৃথিবীর নানান দেশে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকের মতে এই সব গল্পের জন্ম তুরস্কদেশে, কারণ সেখানে এখনো প্রতিবছর নাসীরুদ্দীনের জন্মোৎসব পালন করা হয়।

মোল্লা নাসীরুদ্দীন যে ঠিক কেমন লোক ছিলেন সেটা তার গল্প পড়ে বোঝা মুশকিল। এক এক সময় তাকে মনে হয় বোকা, আবার এক এক সময় মনে হয় ভারী বিজ্ঞ। তোমাদের কী মনে হয় সেটা তোমরাই বুঝে নিও।

নাসীরুদ্দীনের বন্ধুরা একদিন তাকে বলল, 'চলো আজ রাত্রে আমরা তোমার বাড়িতে খাব।'

'বেশ, এস আমার সঙ্গে,' বলল নাসীরুদ্দীন।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে সে বলল, 'তোমরা একটু সবুর কর, আমি আগে গিন্নীকে বলে আসি ব্যবস্থা করতে।'

গিন্নীত ব্যাপার শুনে এই মারে ত সেই মারে। বললেন, 'চালাকি পেয়েছ? এত লোকের রান্না কি চাট্টিখানি কথা? যাও, বলে এস ওসব হবেটবে না।'

নাসীরুদ্দীন মাথায় হাত দিয়ে বলল, 'দোহাই গিন্নী, ও আমি বলতে পারব না। ওতে আমার ইজ্জত থাকবে না।'

'তবে তুমি ওপরে গিয়ে ঘরে বসে থাক। ওরা এলে যা বলার আমি বলব।'

এদিকে নাসীরুদ্দীনের বন্ধুরা প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে শেষটায় তার বাড়ির সামনে এসে হাঁক দিল, 'ওহে নাসীরুদ্দীন, আমরা এসেছি, দরজা খোল।'

দরজা ফাঁক হল, আর ভিতর থেকে শোনা গেল গিন্নীর গলা।

'ও বেরিয়ে গেছে।'

বন্ধুরা অবাক। 'কিন্তু আমরা ত ওকে ভিতরে ঢুকতে দেখলাম। আর সেই থেকে ত আমরা দরজার দিকেই চেয়ে আছি। ওকে ত বেরোতে দেখিনি।'

গিন্নী চুপ। বন্ধুরা উত্তরের অপেক্ষা করছে। নাসীরুদ্দীন দোতলার ঘর থেকে সব শুনে আর থাকতে না পেরে বলল, 'তোমরা ত সদর দরজায় চোখ রেখেছ, সে বুঝি খিড়কি দিয়ে বেরোতে পারে না?'

নাসীরুদ্দীন তার বাড়ির বাইরে বাগানে কী যেন খুঁজছে। তাই দেখে একজন জিগ্যেস করল, 'ও মোল্লাসাহেব, কী হারালে গো?'

'আমার চাবিটা', বললে নাসীরুদ্দীন।

তাই শুনে লোকটিও বাগানে এসে চাবি খুঁজতে লাগল। কিছুক্ষণ খোঁজার পর সে জিগ্যেস করল, 'ঠিক কোনখানটায় ফেলেছিলে চাবিটা মনে পড়ছে?'

'আমার ঘরে।'

'সে কি! তাহলে এখানে খুঁজছ কেন?'

'ঘরটা অন্ধকার', বললে নাসীরুদ্দীন। 'যেখানে খোঁজার সুবিধে সেইখেনেই ত খুঁজব।'

নাসীরুদ্দীনের পোষা পাঁঠাটার উপর পড়শীদের ভারী লোভ, কিন্তু নানান ফিকির করেও তারা সেটাকে হাত করতে পারে না। শেষটায় একদিন তারা নাসীরুদ্দীনকে বললে, 'ও মোল্লাসাহেব, বড় দুঃসংবাদ। কাল নাকি প্রলয় হবে। এই দুনিয়ার সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'তাহলে পাঁঠাটাকেও ধ্বংস করা হোক,' বললে নাসীরুদ্দীন।

সন্ধেবেলা পড়শীরা দলেবলে এসে দিব্যি ফুর্তিতে পাঁঠার ঝোল খেয়ে গায়ের জামা খুলে নাসীরুদ্দীনের বৈঠকখানায় নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে তারা দেখে তাদের জামা উধাও।

'প্রলয়ই যদি হবে,' বললে নাসীরুদ্দীন, 'তাহলে জামাগুলো আর কোন কাজে লাগবে ভাই? তাই আমি সেগুলোকে আগুনে ধ্বংস করে ফেলেছি।'

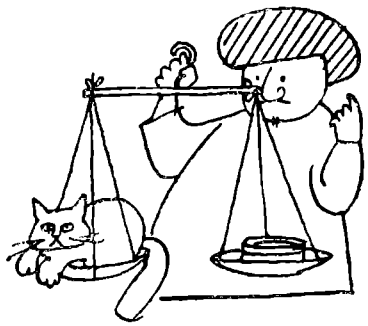

নাসীরুদ্দীন বাজার থেকে মাংস কিনে এনে তার গিন্নীকে দিয়ে বললে, 'আজ কাবাব খাব; বেশ ভালো করে রাঁধ দিকি।'

গিন্নী রান্নাটান্না করে লোভে পড়ে নিজেই সব মাংস খেয়ে ফেলল। কর্তাকে ত আর সে কথা বলা যায় না, বলল, 'বেড়ালে খেয়ে ফেলেছে।'

'এক সের মাংস সবটা খেয়ে ফেলল?'

'সবটা।'

বেড়ালটা কাছেই ছিল। নাসীরুদ্দীন সেটাকে দাঁড়িপাল্লায় চড়িয়ে দেখল ওজন ঠিক এক সের।

'এটাই যদি সেই বেড়াল হয়', বললে নাসীরুদ্দীন, 'তাহলে মাংস কোথায়? আর এটাই যদি সেই মাংস হয়, তাহলে বেড়াল কোথায়?'

নাসীরুদ্দীনের যখন বয়স খুব কম তখন একদিন তার বাপ তাকে বললেন, 'ওরে নসু, এবার থেকে খুব ভোরে উঠিস।'

'কেন বাবা?'

'অভ্যেসটা ভালো,' বললেন নসুর বাপ। 'আমি সেদিন ভোরে উঠে বেড়াতে গিয়ে রাস্তার মধ্যিখানে পড়ে থাকা এক থলে মোহর পেয়েছি।'

'সে থলে ত আগের দিন রাত্রেও পড়ে থাকতে পারে, বাবা।'

'সেটা কথা নয়। আর তাছাড়া আগের দিন রাত্রেও ওই পথ দিয়ে হাঁটছিলুম আমি; তখন কোনো মোহরের থলে ছিল না।'

'তাহলে ভোরে উঠে লাভ কি বাবা?' বললে নাসীরুদ্দীন। 'যে লোক মোহরের থলি হারিয়েছিল সে নিশ্চয় তোমার চেয়েও বেশি ভোরে উঠেছিল।'

শিকারে বেরিয়ে পথে প্রথমেই নাসীরুদ্দীনের সামনে পড়ে রাজামশাই ক্ষেপে উঠলেন। 'লোকটা অপয়া। আজ আমার শিকার পণ্ড। ওকে চাবকে হটিয়ে দাও।'

রাজার হুকুম তামিল হল।

কিন্তু শিকার হল জবরদস্ত।

রাজা নাসীরুদ্দীনকে ডেকে পাঠালেন।

'কসুর হয়ে গেছে নাসীরুদ্দীন। আমি ভেবেছিলাম তুমি অপয়া। এখন দেখছি তা নয়।'

নাসীরুদ্দীন তিন হাত লাফিয়ে উঠল।

'আপনি ভেবেছিলেন আমি অপয়া? আমায় দেখে আপনি ছাব্বিশটা হরিণ মারলেন, আর আপনাকে দেখে আমি বিশ ঘা চাবুক খেলাম। অপয়া যে কে সেটা বুঝতে পারলেন না?'

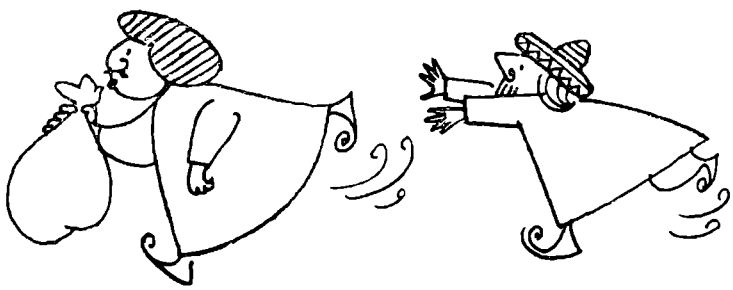

নাসীরুদ্দীন একজন লোককে মুখ ব্যাজার করে রাস্তার ধারে বসে থাকতে দেখে জিগ্যেস করল তার কী হয়েছে। লোকটা বলল, 'আমার জীবন বিষময় হয়ে গেছে মোল্লাসাহেব। হাতে কিছু পয়সা ছিল, তাই নিয়ে দেশ ঘুরতে বেরিয়েছি, যদি কোনো সুখের সন্ধান পাই।'

লোকটির পাশে তার বোঁচকায় কতগুলো জিনিসপত্র রাখা ছিল। তার কথা শেষ হওয়ামাত্র নাসীরুদ্দীন সেই বোঁচকাটা নিয়ে বেদম বেগে দিল চম্পট। লোকটাও হাঁ হাঁ করে তার পিছু নিয়েছে, কিন্তু নাসীরুদ্দীনকে ধরে কার সাধ্য! দেখতে দেখতে সে রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকে হাওয়া। এই ভাবে লোকটিকে মিনিটখানেক ধোঁকা দিয়ে সে আবার সদর রাস্তায় ফিরে বোঁচকাটাকে রাস্তার মাঝখানে রেখে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল। এদিকে সেই লোকটিও কিছুক্ষণ পরে এসে হাজির। তাকে এখন আগের চেয়েও দশগুণ বেশি বেজার দেখাচ্ছে। কিন্তু রাস্তায় তার বোঁচকাটা

পড়ে আছে দেখেই সে মহাফুর্তিতে একটা চীৎকার দিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

গাছের আড়াল থেকে নাসীরুদ্দীন বলল, 'দুঃখীকে সুখের সন্ধান দেবার এও একটা উপায়।'

তর্কবাগীশ মশাই নাসীরুদ্দীনের সঙ্গে তর্ক করবেন বলে দিনক্ষণ ঠিক করে তার বাড়িতে এসে দেখেন মোল্লাসাহেব বেরিয়ে গেছেন। মহা বিরক্ত হয়ে তিনি মোল্লার সদর দরজায় খড়ি দিয়ে লিখে গেলেন 'মুর্খ'।

নাসীরুদ্দীন বাড়ি ফিরে এসে কাণ্ড দেখে এক হাত জিভ কেটে এক দৌড়ে তর্কবাগীশ মশাইয়ের বাড়ি গিয়ে তাকে বলল, 'ঘাট হয়েছে পণ্ডিতমশাই, আমি বেমালুম ভুলে গেসলুম আপনি আসবেন। শেষটায় বাড়ি ফিরে দরজায় আপনার নামটা লিখে গেছেন দেখে মনে পড়ল।'

গাঁয়ের লোকে একদিন ঠিক করল নাসীরুদ্দীনকে নিয়ে একটু মশকরা করবে। তারা তার কাছে গিয়ে সেলাম ঠুকে বলল, 'মোল্লাসাহেব, আপনার এত জ্ঞান, একদিন মসজিদে এসে আমাদের তত্ত্বকথা শোনান না।' নাসীরুদ্দীন এক কথায় রাজি।

দিন ঠিক করে ঘড়ি ধরে মসজিদে হাজির হয়ে নাসীরুদ্দীন উপস্থিত সবাইকে সেলাম জানিয়ে বললে, 'ভাই সকল, বলত দেখি আমি এখন তোমাদের কী বিষয় বলতে যাচ্ছি?'

সবাই বলে উঠল, 'আজ্ঞে সে ত আমরা জানি না।'

মোল্লা বলল, 'এটাও যদি না জান তাহলে আর আমি কী বলব। যাদের বলব তারা এত অজ্ঞ হলে চলে কি করে?'

এই বলে নাসীরুদ্দীন রাগে গজগজ করতে করতে মসজিদ ছেড়ে সোজা বাড়ি চলে এল।

গাঁয়ের লোক নাছোড়বান্দা। তারা আবার তার বাড়িতে গিয়ে হাজির।

'আজ্ঞে, আসছে শুক্রবার আপনাকে আর একটিবার আসতেই হবে মসজিদে।'

নাসীরুদ্দীন গেলেন, আর আবার সেই প্রথম দিনের প্রশ্ন দিয়েই শুরু করলেন। এবার সব লোকে একসঙ্গে বলে উঠল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি।'

'সবাই জেনে ফেলেছ? তাহলে ত আর আমার কিছু বলার নেই'—এই বলে নাসীরুদ্দীন আবার বাড়ি ফিরে গেলেন। গাঁয়ের লোক তবুও ছাড়ে না। পরের শুক্রবার নাসীরুদ্দীন আবার মসজিদে হাজির হয়ে তাঁর সেই বাঁধা প্রশ্ন করলেন। এবার আর মোল্লাকে রেহাই দেবে না গাঁয়ের লোক, তাই অর্ধেক বলল 'জানি', অর্ধেক বলল 'জানি না'।

'বেশ, তাহলে যারা জান তারা বলো, আর যারা জান না তারা শোন'—এই বলে নাসীরুদ্দীন আবার ঘরমুখো হলেন।

নাসীরুদ্দীন বাড়ির ছাতে কাজ করছে, এমন সময় এক ভিখিরি রাস্তা থেকে হাঁক দিল, 'মোল্লাসাহেব, একবারটি নিচে আসবেন।'

নাসীরুদ্দীন ছাত থেকে রাস্তায় নেমে এলেন। ভিখিরি বলল, 'দুটি ভিক্ষে দেবেন মোল্লাসাহেব?'

'তুমি এই কথাটা বলার জন্য আমায় ছাত থেকে নামালে?'

ভিখিরি কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'মাপ করবেন মোল্লাসাহেব,—গলা ছেড়ে ভিক্ষে চাইতে শরম লাগে।'

'হুঁ···তা তুমি ছাতে এসো আমার সঙ্গে।'

ভিখিরি তিনতলার সিঁড়ি ভেঙে ছাতে ওঠার পর নাসীরুদ্দীন বললে, 'তুমি এসো হে ভিক্ষেটিক্ষে হবে না।'

নাসীরুদ্দীন লেখাপড়া বেশি জানতনা ঠিকই, কিন্তু তাঁর গাঁয়ে এমন অনেক লোক ছিল যাদের বিদ্যে তার চেয়েও অনেক কম। তাদেরই একজন নাসীরুদ্দীনকে দিয়ে নিজের ভাইকে একটা চিঠি লেখাল। লেখা শেষ হলে পর সে বলল, 'মোল্লাসাহেব কী লিখলেন একবারটি পড়ে দেন, যদি কিছু বাদটাদ পড়ে গিয়ে থাকে।'

নাসীরুদ্দীন 'প্রিয় ভাই আমার' পর্যন্ত পড়ে ঠেকে গিয়ে বলল, 'পরের কথাটা 'বাক্স' না 'গরম' না 'ছাগল' সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।'

'সেকি মোল্লাসাহেব, আপনার লেখা চিঠি আপনিই পড়তে পারেন না ত অপরে পড়বে কী করে?'

'সেটা আমি কী জানি? বললে নাসীরুদ্দীন। 'আমায় লিখতে বললে আমি লিখলাম। পড়াটাও কি আমার কাজ নাকি?'

লোকটা কিছুক্ষণ ভেবে মাথা নেড়ে বলল, 'তা ঠিকই বললেন বটে। তাছাড়া, এ চিঠি ত আর আপনাকে লেখা নয়। কাজেই আপনি পড়তে না পারলে আর ক্ষতি কী?'

'হক্ কথা,' বললে নাসীরুদ্দীন।

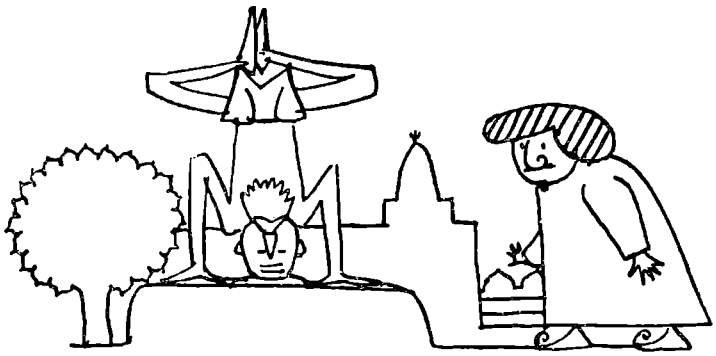

নাসীরুদ্দীন একবার ভারতবর্ষে এসে এক সাধুর দেখা পেয়ে ভাবল, 'আমার মতো জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তির পক্ষে সাধুর সাক্ষাৎ পাওয়া পরম সৌভাগ্য। এঁর সঙ্গে আলাপ না করলেই নয়।'

তাঁকে জিজ্ঞেস করতে সাধু বললেন তিনি একজন যোগী। 'ঈশ্বরের সৃষ্ট যত প্রাণী আছে সকলের সেবাই তাঁর ধর্ম।

নাসীরুদ্দীন বলল, 'ঈশ্বরের সৃষ্ট একটি মৎস্য একবার আমাকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছিল।'

একথা শুনে যোগী আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললেন, 'আমি এত দীর্ঘকাল প্রাণীর সেবা করেও তাদের এত অন্তরঙ্গ হতে পারিনি। একটি মৎস্য আপনার প্রাণরক্ষা করেছে শুনে এই দেখুন আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন না ত কে থাকবে?'

নাসীরুদ্দীন যোগীর সঙ্গে থেকে তার কাছ থেকে যোগের নানারকম কসরৎ শিক্ষা করল। শেষে একদিন যোগী বললেন, 'আর ধৈর্য রাখা সম্ভব নয়। অনুগ্রহ করে যদি সেই মৎস্যের উপাখ্যানটি শোনান।'

'একান্তই শুনবেন ?'

'হে গুরু !' বললেন যোগী, 'শোনার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।'

'তবে শুনুন', বললে নাসীরুদ্দীন। 'একবার খাদ্যাভাবে প্রাণ যায় যায় অবস্থায় আমার বঁড়শীতে একটি মাছ ওঠে আমি সেটা ভেজে খাই।'

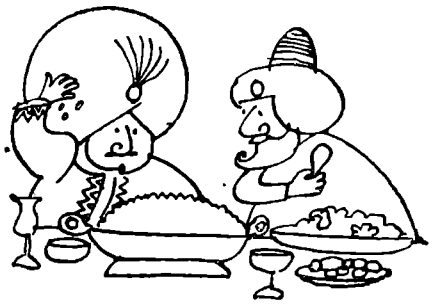

এক ধনী লোকের বাড়িতে ভোজ হবে খবর পেয়ে নাসীরুদ্দীন সেখানে গিয়ে হাজির।

ঘরের মাঝখানে বিশাল টেবিলের উপর লোভনীয় সব খাবার সাজানো রয়েছে রূপোর পাত্রে। টেবিল ঘিরে কুরসি পাতা, তাতে বসেছেন হোমরা-চোমরা সব খাইয়েরা। নাসীরুদ্দীন সেদিকে এগোতেই কর্মকর্তা তার মামুলি পোষাক দেখে তাকে ঘরের এক কোণায় ঠেলে দিলেন। নাসীরুদ্দীন বুঝল সেখানে খাবার পৌঁছতে হয়ে যাবে রাত কাবার। সে আর সময় নষ্ট না করে সোজা বাড়ি ফিরে গিয়ে তোরঙ্গ থেকে তার ঠাকুরদাদার আমলের একটা ঝলমলে আলখাল্লা আর একটা মণিমুক্তো বসানো আলিশান বার করে সেগুলো পরে আবার নেমন্তন্ন বাড়িতে ফিরে গেল।

এবার কর্মকর্তা তাকে একেবারে খাস টেবিলে বসিয়ে দিলেন, আর বসামাত্র নাসীরুদ্দীনের সামনে এসে হাজির হল ভুরভুরে খুশবুওয়ালা পোলাওয়ের পাত্র। নাসীরুদ্দীন প্রথমেই পাত্র থেকে খানিকটা পোলাও তুলে নিয়ে তার আলখাল্লায় আর পাগড়িতে মাখিয়ে দিল। পাশে বসেছিলেন এক আমীর। তিনি ভারী অবাক হয়ে বললেন, 'জনাব, আপনি খাদ্যদ্রব্য যেভাবে ব্যবহার করছেন তা দেখে আমার কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার অর্থ জানতে পারলে আমি বিশেষ বাধিত হব।'

'অর্থ খুবই সোজা', বললে নাসীরুদ্দীন। 'এই আলখাল্লা আর এই পাগড়ির দৌলতেই আমার সামনে এই ভোজের পাত্র। এদের ভাগ না দিয়ে আমি একা খাব, সে কি হয় ?'

একদিন বাড়িতে দুজন লোকের পায়ের শব্দ পেয়ে নাসীরুদ্দীন ভয়ে একটা আলমারিতে ঢুকে লুকিয়ে রইল।

লোকদুটো ছিল চোর। তারা বাক্সপ্যাঁটরা সবই খুলছে, সেই সঙ্গে আলমারিটাও খুলে দেখে তাতে মোল্লাসাহেব ঘাপটি মেরে আছেন।

'কী হল মোল্লাসাহেব, লুকিয়ে কেন?'

'লজ্জায়', বললে নাসীরুদ্দীন। 'আমার বাড়িতে তোমাদের নেবার মতো কিছুই নেই তাই লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছি না ভাই।'

এক চাষা নাসীরুদ্দীনের কাছে এসে বলল, 'বাড়িতে চিঠি দিতে হবে মোল্লাসাহেব। মেহেরবানি করে আপনি যদি লিখে দেন।'

নাসীরুদ্দীন মাথা নাড়লে। 'সে হবে না।'

'কেন মোল্লাসাহেব?'

'আমার পায়ে জখম।'

'তাতে কী হল মোল্লাসাহেব?' চাষা অবাক হয়ে বলল। 'পায়ের সঙ্গে চিঠির কী?'

নাসীরুদ্দীন বললে, 'আমার হাতের লেখা কেউ পড়তে পারে না। তাই চিঠির সঙ্গে আমাকেও যেতে হবে সে চিঠি পড়ে দিতে। জখম পায়ে সেটা হবে কি করে শুনি?'

নাসীরুদ্দীন এক বাড়িতে চাকরের কাজ করছে। মনিব তাকে একদিন ডেকে বললেন, 'তুমি অযথা সময় নষ্ট কর কেন হে বাপু? তিনটে ডিম আনতে কেউ তিনবার বাজার যায়? এবার থেকে একেবারে সব কাজ সেরে আসবে।'

একদিন মনিবের অসুখ করেছে, তিনি নাসীরুদ্দীনকে ডেকে বললেন, 'হাকিম ডাক।'

নাসীরুদ্দীন গেল, কিন্তু ফিরল অনেক দেরিতে, আর সঙ্গে একগুষ্টি লোক নিয়ে।

মনিব বললেন, 'হাকিম কই।'

'তিনি আছেন, আর সঙ্গে আরো আছেন,' বললে নাসীরুদ্দীন।

'আরো কেন ?'

'আজ্ঞে হাকিম যদি বলেন পুলটিশ দিতে, তার জন্য লোক চাই। জল গরম করতে কয়লা লাগবে, কয়লাওয়ালা চাই। আপনার শ্বাস উঠলে পর কোরান পড়ার লোক চাই, আর আপনি মরলে পরে লাশ বইবার লোক চাই।'

তোলাতুলি

অসিত বরণ হাজরা

পূজোর আগে ফুল তুল্‌বো তারও আগে তুল্‌বো চাঁদা,
তুলবো ঘুঁষি নাকের ডগায় বাপ-তুলে গাল দিসনে হাঁদা !

ঢেকুর তুলে জানিয়ে দেবো ভরা পেটের কৃতজ্ঞতা,
ক্যামেরা চাই তুলতে ছবি এটাই হলো সত্যিকথা !

তুল্‌লে যদি প্রসংগটা—হাঁই তুলে ভাই থামলে কেন ?
তেঁতুলে-তে ঝাল-বাটা দাও, নুন দিতে ভুল হয় না যেন !

মাতুলেরাই সবাই সেরা কিল-চড় নেই মামার বাড়ি
প্রলাপ বকে বাতুলেরাই—পাচ্ছি প্রমাণ কাঁড়ি-কাঁড়ি !

সের ছটাকের সংগে 'তোলা' বিদায় নিল ওজন থেকে,
হাত তোলো ভাই, কাল সকালে বন ভোজনে যাচ্ছো কে-কে ?